তারিখ 21 JAN 2009 ……
পৃষ্ঠা …২০ কলাম …৬…

দিন বদলায়

মিতবাক

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দিন বদলের সুবাতাস না বইলে দেশের অন্ধকার কাটবে না

চবি জবি জাবি- সন্ত্রাস-সংকুল আর কত দেখাবি? ১৮ তারিখের ইত্তেফাকের শীর্ষ খবর পড়ে এক রসিক পাঠক আমার সামনে সখেদে মন্তব্যটা করেছিলেন। চবি জবি জাবি এবং রাবি ঢাবি যে দেশের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অভ্যন্তরে গঠিত ডাকনাম, সেটা সংবাদপত্রের পাঠকদের ভাল জানা হয়ে গেছে। কারণ প্রায়ই খবরের বড় শিরোনাম হয়ে ওঠে এগুলি। দেশের প্রধান বিদ্যাপীঠগুলির বড় খবরের শিরোনাম হয়ে ওঠা তো জাতির জন্য খুশির খবর হয়ে ওঠার কথা, কিন্তু বাস্তবে ঘটে চলেছে উল্টোটা। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তবু প্রতি বছর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশের দিন ভালো খবরের শিরোনাম হয়ে আমাদের গর্ব ও আনন্দের কারণ হয়ে ওঠে। কিন্তু দু'একটি বাদে সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেন পণ করেছে, এরা বারবার নেতিবাচক বড় ভয়ঙ্কর খবরের শিরোনাম হয়ে জাতিকে ভয় দেখিয়েই ছাড়বে। তবে নতুন নির্বাচিত সরকারের শুভযাত্রায় এমনটি আশা করেনি মানুষ।

২০০৯ সালটা বাংলাদেশের মানুষ দিন বদলের যে স্বপ্ন-আশা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে, তা কি বিশ্ববিদ্যালয়ের সোনার ছেলেরা সন্ত্রাসী কায়দায় উড়িয়ে দিতে চায়? এমন শঙ্কা অনেকের মনেই জেগে উঠেছে। কারণ নতুন বছরে নির্বাচিত নতুন সরকারের শুভযাত্রা যখন বহু মানুষের মনে অভূতপূর্ব আশা-উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে, শুরু থেকেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সরকারের দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপগুলি প্রশংসিত হচ্ছে সব মহলে, তখন বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি দল আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন ছাত্রলীগের কর্মীরা করছে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী আচরণ। শপথ গ্রহণের আগেই আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা প্রতিহিংসা ও সব ধরনের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তাঁর দৃঢ় অবস্থান থেকে জাতিকে নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলেনি ছাত্রলীগের কর্মীরা। সেই পুরনো দলবাজি, আধিপত্য বিস্তার, হল দখল এবং সন্ত্রাস-সংঘর্ষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ তছনছ করা হয়েছে বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

চবি, জবি ও জাবি ক্যাম্পাসে অব্যাহত সংঘর্ষের ঘটনায় কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কার্যক্রম আগামী একমাস স্থগিত করা হয়েছে। সতর্ক করা হয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগকে। শিক্ষাঙ্গনে বিশৃংখলা ও সহিংস ঘটনার সঙ্গে জড়িতরা যে দলের হোক না কেন, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে সরকার। উত্তেজনা ও অস্থিরতা বিরাজ করলেও অশান্ত হয়ে ওঠা ক্যাম্পাসগুলির পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে অনেকটা। কিন্তু ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে বিজয়ের পর থেকে ইতিমধ্যে ছাত্রলীগ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়েছে, তা ছাত্র রাজনীতির পুরনো নেতিবাচক রূপেরই ধারাবাহিক প্রকাশ মাত্র। কাজেই প্রধানমন্ত্রীর কঠোর অবস্থান ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নির্দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী পরিস্থিতি সাময়িক নিয়ন্ত্রণে আনলেও প্রশ্ন ও শঙ্কা থেকেই যাবে। প্রধানমন্ত্রী যে নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি জাতিকে উপহার দেয়ার কথা বলেছেন এবং দিন বদলের যে লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করেছে বর্তমান সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তার প্রভাব আসবে কতখানি? কীভাবেইবা অতীতের দূষিত রাজনীতির রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হবে দেশের উচ্চ শিক্ষাঙ্গনগুলি?

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা উপযোগী স্বাভাবিক ও সুস্থ পরিবেশ দেয়ার দাবিটি গণদাবিতে পরিণত হয়েছে অনেক আগেই। স্বাধীনতার পর থেকে দেশে উচ্চ শিক্ষার চাহিদা মেটাতে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩১-এ দাঁড়িয়েছে বটে, কিন্তু পরিমাণ বা গুণগত মান কোনো দিক থেকেই এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতির চাহিদা সম্পূর্ণ মেটাতে পারছে না। উপরন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এ যাবৎ ছাত্ররাজনীতির নামে যে বিশৃঙ্খলা ও খুন-খারাপির মতো ঘটনার জন্ম দিয়েছে, তাতে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জাতির 'সেন্টার অব এক্সেলেন্সি' নয়, বরং সন্ত্রাসের উর্বরভূমি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে বেশি। এর মূল কারণ ছিল দলীয় রাজনীতির নিয়ন্ত্রণাধীন ছাত্র রাজনীতি। এই ধ্বংসাত্মক অপরাজনীতির প্রভাব থেকে দেশকে ভবিষ্যতে নেতৃত্বদানকারী ছাত্রছাত্রীদের রক্ষার জন্য ক্যাম্পাসে দলীয় রাজনীতি বন্ধের দাবিটিও অনেক সময় জোরালো হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহমদও একবার সকল রাজনৈতিক দলের কাছে ছাত্র রাজনীতি নিয়ে একটি জাতীয় ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। বিগত বিএনপি জোট সরকারের সময়েও বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় ছাত্র রাজনীতি বন্ধের দাবিটি জোরালো হয়ে উঠেছিল। সদ্য বিদায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর ছাত্র সংগঠনকে দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি থেকে মুক্ত করার জন্য আইন প্রণয়নের কথা উঠেছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এমন উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলেও ঐ সময় বিতর্ক হয়েছে। নির্বাচন কমিশন গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ (আরপিও) বলে রাজনৈতিক দলগুলির নিবন্ধনের জন্য গঠনতন্ত্রে ছাত্র সংগঠনকে অঙ্গ বা সহযোগী সংগঠন হিসেবে না রাখার শর্ত আরোপ করে। প্রধান রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি 'নিজস্ব গঠনতন্ত্র দ্বারা ছাত্র সংগঠনগুলি পরিচালিত হবে' এই শর্ত মেনে নিবন্ধন পেলেও, ছাত্র রাজনীতি এখনও মূল দলের মূল ধারার রাজনীতি দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এ বিষয়ে গতকাল প্রকাশিত ইত্তেফাকে একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সংঘাতপূর্ণ ছাত্র রাজনীতি থামানোর লক্ষ্যে নিজেদের নেয়া পদক্ষেপ শেষ পর্যন্ত বিফলেই যাচ্ছে বলে নির্বাচন কমিশন মনে করছে। রাজনৈতিক দলগুলি ছাত্র সংগঠনগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করছে না বললেও মূলত দলের নিয়ন্ত্রণেই চলছে তারা। ২৯ ডিসেম্বরে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়ের পর শেখ হাসিনা দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মীর প্রতি বিজয় মিছিল না করার নির্দেশ দিয়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে প্রতিহিংসার উত্থান রোধ করতে চেয়েছিলেন। শেখ হাসিনার এই সিদ্ধান্তের মধ্যে দলের চেয়ে দেশ ও জাতির স্বার্থকে বড় করে দেখার সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর নির্দেশনা অগ্রাহ্য করে বিচ্ছিন্নভাবে বেশকিছু উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগ যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়েছে, সেখানে বিরোধী দলীয় প্রতিপক্ষের উপস্থিতি না থাকলেও, বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার মনোবৃত্তি এবং ক্ষমতা নিয়ে দলীয় কোন্দল ঘটনার মূল হিসেবে কাজ করেছে বলে মনে করছেন অনেকেই।

> তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ২০০৭-এর আগস্ট মাসে জরুরি অবস্থার মধ্যেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সহিংস ঘটনা গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছিল, কারফিউ জারি করে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়েছিল সরকারকে। এই ঘটনার জের সামাল দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে বেশ সময় লেগেছে। সেই সহিংস ঘটনা তদন্তে বিচারপতি হাবিবুর রহমান খানের নেতৃত্বে যে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল, সেই কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনেও শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি বন্ধ করার জন্য জোরালো সুপারিশ করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে শিক্ষক রাজনীতির যে সুযোগ রয়েছে, কমিশন তা সংশোধন ও প্রয়োজনে পুরো অধ্যাদেশটি পুনর্মূল্যায়নের সুপারিশ করেছে। বিচারপতি হাবিবুর রহমান খানের তদন্ত প্রতিবেদন গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯ জানুয়ারি একটি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিকের মন্তব্য প্রতিবেদনে ছাত্রলীগকে সামলানোর জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে। এই প্রসঙ্গে ১৯৯৬ সালে ও ২০০১ সালে নির্বাচনে বিজয়ী দল ক্ষমতায় এলে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছাত্র সংগঠন তাদের আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়েছিল, সেই ইতিহাসও স্মরণ করা হয়েছে। এখানে একটা কথা না বললেই নয়। সেটা হচ্ছে ক্ষমতাসীনরা শুধু নিজ দলের নিয়ন্ত্রণাধীন ছাত্র সংগঠনকে সাময়িকভাবে সামলে বা নিয়ন্ত্রণে রাখলেই ছাত্র রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন হবে না, সেটা অতীতে বারবার প্রমাণিত হয়েছে। দেশের প্রধান-অপ্রধান প্রতিটি রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের সব সশস্ত্র ক্যাডারকেই নিরস্ত্র করতে হবে, ছাত্রদের চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, আন্দোলনের নামে ভাংচুর ইত্যাদি কঠোরভাবে বন্ধ করতে হবে। দখল প্রক্রিয়া থেকে একটি দল বিরত থাকবে, অন্য ছাত্র সংগঠনগুলি সেই প্রক্রিয়ার সাথে আগের ন্যায় যুক্ত থাকবে,-তেমনটা হলে [illegible] হোক, সমস্যার সমাধান হবে না। কাজেই ছাত্র রাজনীতির ধ্বংসাত্মক দিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষা পরিবেশকে স্বাভাবিকভাবে নির্বিঘ্ন রাখার দিকটি নিশ্চিত করতে হবে। এটা শুধু সরকারি দলের একক সিদ্ধান্তের ব্যাপার নয়। সরকারি ও বিরোধীসহ প্রধান রাজনৈতিক দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ছাত্র-রাজনীতির পক্ষে-বিপক্ষে যতই বিতর্ক হোক, একটি বিষয় অস্বীকার করবে না কেউ, ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্র-আন্দোলন এ দেশের অনেক মহৎ অর্জনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। ছাত্র রাজনীতি সেই ঐতিহ্য ও সুস্থ ধারার রাজনীতির সঙ্গে নেই, তা বিগত আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের শাসনামলেও দেশবাসীর কাছে বারংবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংগঠনের নামে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আধিপত্য বিস্তার, মূল দলীয় ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত থেকে ছাত্রনেতাদের চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, সশস্ত্র সন্ত্রাস শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশকে তছনছ করেছে অসংখ্যবার। অনির্দিষ্ট কালের জন্য অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ রাখতে হয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ২০০৭-এর আগস্ট মাসে জরুরি অবস্থার মধ্যেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সহিংস ঘটনা গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছিল, কারফিউ জারি করে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়েছিল সরকারকে। এই ঘটনার জের সামাল দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে বেশ সময় লেগেছে। সেই সহিংস ঘটনা তদন্তে বিচারপতি হাবিবুর রহমান খানের নেতৃত্বে যে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল, সেই কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনেও শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি বন্ধ করার জন্য জোরালো সুপারিশ করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে শিক্ষক রাজনীতির যে সুযোগ রয়েছে, কমিশন তা সংশোধন ও প্রয়োজনে পুরো অধ্যাদেশটি পুনর্মূল্যায়নের সুপারিশ করেছে। বিচারপতি হাবিবুর রহমান খানের তদন্ত প্রতিবেদন গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি বন্ধের দাবিটি নতুন নয়। রাষ্ট্রক্ষমতা ঘিরে বিগত আমলের দুর্বৃত্তায়নকবলিত রাজনৈতিক ধারায় ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এই দাবিটি অনিবার্য ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এখন এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে বর্তমান নির্বাচিত সরকারকে। সরকারের দিন বদলের সনদ ও ভিশন ২০২১-এ শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত অবশ্যই। মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা খাতে সরকারকে অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় সংস্কার আনার কাজ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নকারী দলীয় ও নেতিবাচক ছাত্ররাজনীতির বিষয়টি ফয়সালা করার ব্যাপারটা আর ধামাচাপা দিয়ে রাখা যাবে না।

বিশ্বায়নের এ যুগে বিশ্ববাস্তবতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সর্বক্ষেত্রে জাতির জন্য যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য অতীতের দলীয় রাজনীতির কলুষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে মুক্ত করার বিষয়টি কোনো দলের নির্বাচনী ইশতেহারে থাক আর না থাক, বিপুলভাবে জনসমর্থিত এ সরকারের জন্য বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবেই বিরাজ করছে। বিশ্বে কোনো সভ্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় ছাত্র রাজনীতির অস্তিত্ব বলে কিছু নেই। কোনো রাজনৈতিক দলের লেজুড় হিসেবে উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্গ সংগঠন থাকা অকল্পনীয়। অক্সফোর্ড, হার্ভার্ড, ক্যামব্রিজ, মেলবোর্ন, টোকিও ও বিশ্বের অন্যান্য নামীদামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল, ছাত্রশিবির বা ছাত্রলীগ কর্মীদের মতো রাজনৈতিক সহিংসতায় উন্মত্ত হয়েছে, এমন ঘটনার কথা শোনা যায় না কখনো। কাজেই ছাত্র রাজনীতির এই ধ্বংসাত্মক প্রবণতা অব্যাহত রেখে শিক্ষার অনুকূল স্বাভাবিক পরিবেশ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ছাত্রছাত্রীদের নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলী অর্জনে সহায়ক মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা যাবে কি?